



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 511 - 516

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘কম্পিউটার গেমস’ উপন্যাসে নগরকেন্দ্রিক ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর মধ্যবিত্ত জীবনের একটি রূপরেখা

কল্যাণ চন্দ্র বর্মণ

গবেষক, বাংলা বিভাগ

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

Email ID: kalyanbarman.bfc@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Modern technology, loneliness, Middle Class, Computer, Social Standing, Flat Culture, Luxury, Acting, Competition.

Abstract

Swapnamoy Chakraborty's 'Computer Games' is a significant novel in twentieth-century Bengali literature. Because it is set against the backdrop of a time when modern technology, particularly computer was just beginning to enter the life of the Bengali middle class. The novel presents a glorious picture of the disintegration of the joint family system in the post-independence period and the growing fascination of the middle class with urban life and modern technology. As a result, the struggle to maintain social status and a deep sense of loneliness and these realities are powerfully reflected in the novel. Proton and Prallika use of computer to escape this loneliness is a key element. Unable to resist the allure of new luxury goods, the middle class strives to earn more money by any how. At the same time, they attempt to fulfill their unfulfilled dreams through their children. Consequently, in the process of realizing their parents' aspirations, children gradually forget their own dreams. In addition, the novel also represent how the middle class is forced to constantly act out a character to maintain their social standing.

Discussion

স্বপ্নময় চক্রবর্তী ১৯৫১ সালের ২৪শে আগস্ট উত্তর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র জীবন থেকেই বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। ফলে রসায়নে বি. এসসি সমাপ্ত করলেও তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। যদিও বাঙালি পাঠক সমাজে স্বপ্নময় চক্রবর্তীকে আলাদাভাবে পরিচিত করানোর কোনো প্রয়োজন নেই। পাঠক মাঝেই তাঁকে চেনেন। দশকের পর দশক ধরে প্রায় সকলেই তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত। স্বপ্নময় চক্রবর্তী লেখক জীবন শুরু করেন সাতের দশকে। তবে প্রথমদিকে কবিতা লিখলেও গল্প ও উপন্যাসেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস ‘চতুষ্পাঠী’। উপন্যাসটি ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হলে পাঠক মহলে সাড়া ফেলেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী। এরপর তাঁর একের পর এক উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য – নবম পর্ব (১৯৯৭), বাস্তুকথা (১৯৯৯), কম্পিউটার গেমস (২০০০), মহামায়া (২০০১), চলো দুবাই (২০০২), অবস্খীনগর

(২০০২) যে জীবন ফড়িংয়ের (২০০৪), নাটাদা (২০১০), পরবাসী (২০১০), কান্তকবি (২০১১), হলদে গোলাপ (২০১৫), ভেজা বারুদ (২০১৬), পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপ (২০১৬), দুনিয়াদারি (২০১৬), শেকড় ছেঁড়া (২০১৭), কথাবলা পুতুল (২০১৭), চার ডাক্তার (২০১৭), কিছু একটা হয়ে যাবে (২০১৯), খিদের পুতুল (২০২০), জলের উপর পানি (২০২১) প্রভৃতি। ‘অবন্তীনগর’ উপন্যাসের জন্য ২০০৫ সালে তিনি বঙ্কিম পুরস্কার পান। তাঁর রচিত ‘হলদে গোলাপ’ উপন্যাসটি ২০১৫ সালে আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত হয়। ‘জলের উপর পানি’ উপন্যাসের জন্য ২০২৩ সালে তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। আমাদের আলোচ্য ‘কম্পিউটার গেমস’ উপন্যাসটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে। একুশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এই উপন্যাসটি লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘কম্পিউটার গেমস’ বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। কেননা বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনে যখন সদ্য আধুনিক প্রযুক্তি তথা কম্পিউটারের প্রচলন শুরু হয়েছিল, সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে এই উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল – কারা এই মধ্যবিত্ত? সাধারণভাবে বিত্তের অধিকারী হিসেবে একেবারে উচ্চস্তরে নয়, আবার একেবারে নিম্নস্তরেও নয়, মধ্যবর্তী স্তরে যাদের অবস্থান – তাদেরই ‘মধ্যবিত্ত’ সামাজিক শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্যে ঠিক এভাবে মধ্যবিত্তদের যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধে রয়েছে। প্রথমত, ‘বিত্ত’ যদি শ্রেণি নির্ণয়ের মানদণ্ড হয়, তাহলে ‘বিত্তের’ বিচারে কেউ হবেন উচ্চমধ্যবিত্ত আবার কেউ নিম্নমধ্যবিত্ত। অনেকে আবার মধ্যবিত্তকে উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত এই তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। সাধারণত উচ্চ মধ্যবিত্ত সামাজিক শ্রেণির মানুষেরা শিক্ষাগত বা পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো বড় চাকুরি বা বৃত্তিভোগীর হয়ে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বেশ সচ্ছল। অপরদিকে, নিম্ন মধ্যবিত্তদের অর্থ উপার্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয় এবং তাদের জীবনযাত্রাও তুলনামূলকভাবে সচ্ছল নয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হল –

“বিত্ত হয়তো আগে কোন এককালে কিছুটা ছিল, এখন আর কানাকড়িও নেই, বলতে গেলে একেবারেই নিঃস্ব, তবু এমন মানুষও আছেন যাঁকে জিজ্ঞাসা করলে বলবেন তিনি ‘মধ্যবিত্ত’ ... ‘মধ্যবিত্ত’ কথাটা তাঁর কাছে স্বতন্ত্র মর্যাদার পরিচায়ক।”^১

তবে এক্ষেত্রে কিছু জিজ্ঞাসা থেকে যায়। প্রথমত, ‘মধ্যবিত্ত’ কথাটি যদি স্বতন্ত্র মর্যাদারই পরিচায়ক হয়ে থাকে, তাহলে সেই মধ্যবিত্ত মানুষটিকে যখন পাওনাদার নিরন্তর তাগাদা দিতে থাকে, তখন তাঁর সেই মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে কি? সুতরাং উপার্জন বা বিত্তের কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠিও নেই যার দ্বারা ‘মধ্যবিত্ত’ মানুষটিকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, কেউ কেউ মনে করেন যে, বিত্ত নয় – অধীত বিদ্যার মাপকাঠিতেই মধ্যবিত্তের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করা যেতে পারে। তাঁদের মতানুযায়ী বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এমনও নজির রয়েছে যাঁরা বিত্ত নয়, জীবনচর্যায় উৎকর্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে সমাজে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও একটা প্রধান সমস্যা দেখা দেয় – বিত্তের মতোই অধীত বিদ্যারও কোনো নির্দিষ্ট পরিমাপ বা মাপকাঠি নেই। তাহলে আমরা বলতে পারি – বিত্ত, অধীত বিদ্যা কিংবা রুচি কোনটিরই নির্দিষ্ট মাপকাঠি দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। রমাপদ চৌধুরী তাঁর ‘আমরা’ নামক প্রবন্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে –

“আসলে মধ্যবিত্ত হ’ল সমাজের মধ্যবৃত্ত। বংশানুক্রমে যারা একটি বিশাল নাগরদোলায় বসে আছে। কখনো ওপরে উঠছে কখনো নীচে নামছে, কিন্তু বৃত্তের বাইরে কদাপি নয়।”^২

প্রকৃতপক্ষে ‘মধ্যবিত্ত’ বলতে মূলত একটি মানসিকতাকে বোঝায়। আজকের দিনেকেরানি থেকে শুরু করে কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক প্রায় সকলেই নিজেদের মধ্যবিত্ত বলে মনে করেন। তবে প্রয়োজনে কেউ উচ্চ আর কেউ বা নিম্ন। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত যতটা না বিত্তে, তার চেয়ে বেশি শিক্ষায় বা আচরণে। তবে অর্থ উপার্জন বা অধীত বিদ্যা বা রুচির এমন কোনো মাপকাঠি নেই যা দিয়ে তার পরিমাপ করা যায়। কেননা মধ্যবিত্তকে যেমন অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উঁচু আসনে দেখা যায়, তেমনি আসনহীন কলকারখানাতেও লক্ষ্য করা যায়। একুশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত ‘কম্পিউটার গেমস’ উপন্যাসটিতে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী মূলত দুটি মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে

শহরে জীবন এবং আধুনিক প্রযুক্তির প্রতি তাদের বিশেষ আকর্ষণকেও তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। পাশাপাশি বিংশ শতাব্দীর শহরে মধ্যবিত্তদের জীবনে যে প্রতিযোগিতা এবং একাকিত্ববোধ দেখা দিয়েছিল, লেখক সেই চিত্রও পাঠকের সন্মুখে তুলে ধরেছেন। এই দুটি পরিবারের একদিকে আছে মানিক-মালবী, অন্যদিকে আছে প্রবাল-মল্লিকার দাম্পত্য জীবন।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘কম্পিউটার গেমস’ উপন্যাসের মানিক এবং প্রবাল দু’জনেই একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। মানিকের পূর্বপুরুষ সাবর্ণ চৌধুরীদের নায়েব ছিলেন। মানিকের ঠাকুর্দা পর্যন্ত নায়েবি করেছেন। ঠাকুর্দার বাবার তৈরি করা বাড়িতেই মানিকের জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা সব বসবাস করেন। মানিকের বাবার ভাগেও দোতলার একটা অংশের সঙ্গে একটা চওড়া বারান্দারও কিছুটা পড়েছিল। মানিক বি. এসসি (কেমিস্ট্রি) পাশ করে এম. এসসিতে সুযোগ না পেলেও একটা ব্যাঞ্চেকেরানি হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে। এরপর মালবীর সঙ্গে তার দাম্পত্য জীবনের সূচনা হয়। বিবাহের পর এই একান্নবর্তী পরিবারেই গড়ে ওঠে মানিকের সাজানো সংসার। সেখানেই তাদের প্রথম সন্তান প্রোটনের জন্ম হয়। প্রথমাবস্থায় এই পরিবারে সংসার করতে মালবীর কোনোরকম অসুবিধা ছিল না। কিন্তু মানিক কেৱানি থেকে যেই অফিসারের পদে উন্নীত হয়, তখনই সেই পরিবারের পরিবেশ মালবীর কাছে যেন বিষময় হয়ে ওঠে। তাই সে অকপটে বলেছে –

“ওবাড়িতে সবসময় হৈ-হৈ। বগড়া-গল্পগুজব-হাসিঠাটা ইয়ারকি। ওখানে কি ছেলে মানুষ হয়?”^৭

তবে মালবী এখানেই থেমে থাকেনি। আর একটি সন্তানের জন্ম দিতে হলে নতুন ফ্ল্যাটেই দেবে বলে সে মানিককে জানিয়ে দেয়। কারণ মালবীর মতে সেই একান্নবর্তী পরিবারে একটি ছেলেই মানুষ করা যেখানে দায় সেখানে দ্বিতীয় সন্তানের কথা চিন্তা করাও পাপ। আর এই নতুন ফ্ল্যাটে এসে ছেলেকে মানুষ করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে একটা মধ্যবিত্ত পরিবারকে কিছুটা সময় তো দিতেই হয়। মানিক ও মালবীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ঔপন্যাসিক সেই অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন –

“নতুন ফ্ল্যাটে এসে কত কি কিনতে হ’ল। সোফা, কালার টিভি, কার্পেট। কত কি। প্রোমোটররা দেয়ালে শুধু প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। প্লাস্টিক পেইন্ট করাতে হ’ল। এইসব করতে করতে, ফ্ল্যাট সাজাতে সাজাতে, মানে পরিবেশ তৈরি করতে করতে প্রোটন বড় হয়ে গেল, আর একা হয়ে গেল। ওদের এবার মনে হ’ল আর একজন কেউ আসুক, ওদের সঙ্গী হোক, প্রোটনের ছোট হয়ে যাওয়া জামা পরুক, প্রোটন একা একা ক্যারাম খেলে বোর্ডের ওপাশে কেউ বসুক। মনে হ’ল বহুদিন হয়ে গেল বিছানায় হিসি নেই, কান্নানেই, খিলখিল হাসি নেই।”^৮

স্বাধীনতা পূর্ব বাংলা উপন্যাসের একটা বড় উপজীব্য হল গ্রামীণ জীবন। গ্রামীণ জীবনকে কেন্দ্র করে বাংলা কবিতা, ছোটগল্প যেমন রচিত হয়েছে, তেমনি উপন্যাস সাহিত্যেরও সৃষ্টি হয়েছে। দুই বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ প্রভৃতির ফলে দেশের অর্থনীতি তলানিতে যাওয়ায় দেশে চরম দারিদ্র্য দেখা দেয়। স্বাভাবিকভাবে বহু সাধারণ মানুষ নতুন জীবনের আশায় গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতে শুরু করে। বাস্তব অবস্থার চাপে পড়ে বহু মধ্যবিত্ত পরিবার তখন কলকাতা শহরকেই তাদের বসবাসের উপযুক্ত বলে মনে করেন। ফলস্বরূপ লেখক এবং পাঠক উভয়েই নগরকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করতে থাকে। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান দুটি মধ্যবিত্ত পরিবারও সেই শ্রোতে গা ভাসিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বলা যায় –

“প্রথম পর্বের নাগরিক স্বাধীনতা কতকটা যেন বোজানো চোখ খুলে আলো দেখার মতো। নগরে এলে সকলে স্বাধীন-এই অনুভূতি হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো। সেই আলো দেখাতে হবে কাজেই স্থাপত্যে তার প্রতীক হল ‘রাউণ্ড আর্চ’, গোলাকার খিলান। স্তম্ভের উপর তোরণ তোরণপথ তোরণাকৃতি বাঁক। তোরণের ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যায়, অনন্ত আকাশ দেখা যায়, দূর দিগন্তের আভাস পাওয়া যায়। তারপর যত জীবনের গতি দ্রুততর হতে থাকে যন্ত্রের বেগে, জীবন যত ‘স্ট্যান্ডার্ডাইজড’ হয় ততই জীবন ও মনের চেহারা মুদ্রিত অক্ষরের মতো একমাপের একধাঁচের ছাঁচঢালা ছাঁটাকাটা হতে থাকে।”^৯

অর্থাৎ একান্তবর্তী পরিবার থেকে বেরিয়ে এসে মানিক ও মালবী তাদের ছেলে প্রোটন ওরফে গিগাকে মানুষের মতো মানুষ করার জন্য ছোটবেলা থেকেই ভিটামিন এ এবং ডি সমৃদ্ধ বেবিঅয়েল থেকে শুরু করে ইংরেজি বইয়ের পাশাপাশি একটি ভালো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, তাদেরকে কয়েকবার স্কুল পাল্টাতে হয়েছে। এমনকি ভালো স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য মানিক যেমন তার ছেলেকে একটি বছর পিছিয়ে দিয়েছে, তেমনি মিথ্যে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে অর্থাৎ অসৎ পথ অবলম্বন করতেও পিছ পায়নি। এরপর প্রোটন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ভর্তির পরীক্ষায় পাশ করলে মানিক গর্ব করে বলে –

“পরীক্ষায় পাশ মানেই তো অনেক। হোক না একটা বছর লস। তাতে কিছু যায় আসে না। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের অ্যাডমিশন টেস্টে পাশ। ব্যাক্ষে খাতির বেড়ে গেল মানিকের। মানিকেরও খুব জিনগর্ব হল।”^৬

যাইহোক মানিক-মালবীর মনে তখন কত যে আনন্দ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ভর্তির পরীক্ষায় পাশ করে যতটা আনন্দ প্রোটন পেয়েছে তার চেয়ে অধিক আনন্দ লাভ করেছে মানিক ও মালবী। কেননা ভালো বিদ্যালয়ে পড়ার ইচ্ছা প্রোটনের থাকুক বা না থাকুক মানিক ও মালবীর সেই ইচ্ছা যে প্রবল ছিল তা ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় ধরা পড়েছে এভাবে –

“প্রোটন ভর্তি হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশন পুরুলিয়াতে। কী ভূক্তি। আঃ। ওখান থেকে তৈরি হয়ে বেরুবে। গতবার আটচল্লিশ জন পরীক্ষা দিয়েছিল, চুয়াল্লিশ জন স্টার। প্রথম কুড়ির ভিতরে তিনজন। প্রোটনও তাহলে হবে প্রথম কুড়ি? উঃ। কী জিনগর্ব।”^৭

কোনো ভালো বিদ্যালয়ে ভর্তি করলেই যে সন্তানের ভালো হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু এই শুভ বুদ্ধি মানিক ও মালবীর ঘটে আসেনি। তারা তখন নিজেদের সামাজিক মর্যাদা ধরে রাখতে বদ্ধ পরিকর। তাই উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই ক্লাস টেস্টে ভালো ফল করতে না পারায় প্রোটনের মন ভেঙে যায়। পাশাপাশি তার মনের মধ্যে ভয় এবং অপরাধবোধ কাজ করে। কেননা প্রোটনের বাবা মিথ্যে সার্টিফিকেট দেখিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে তাকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল। শেষপর্যন্ত প্রোটন রামকৃষ্ণ মিশন ছেড়ে চলে আসে। পরের বছর সে জুলিয়েন স্কুলে ভর্তি হয়। ফলস্বরূপ তার আরও একটি বছর ক্ষতি হয়ে যায়। সময়ের স্রোতে পুরুষদের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীরাও অফিসে, আদালতে, সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পেশায় যোগদানের মধ্য দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে থাকে। আলোচ্য উপন্যাসের মালবী ও মল্লিকা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই প্রসঙ্গে বলা যায় –

“দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলায় জীবন হল ক্রমশ নগরকেন্দ্রিক, গ্রামীণ জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে আসা পরিবারগুলি নগরজীবনে এসে শুধুমাত্র অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্নেই জীবনের নানা ক্ষেত্রে নিজেকে প্রসারিত করেছে – অতিক্রমত নতুন করে শিকড় ছড়াতে চেয়েছে। সেই কারণেই বাড়ির মেয়েদের অফিসে চাকরিতে যাবার অনুমতি মিলেছে। নাগরিক জীবনে ব্যাপক হারে প্রবেশের পর মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের মেয়েরাও অফিসকর্মীরূপে কাজে যোগ দিয়েছে, শুরু হয়েছে তার কাঁধে ব্যাগ বুলিয়ে দশটা-পাঁচটার চাকরি জীবন। কিন্তু এ জীবনকে শুধু মাত্র দশটা-পাঁচটার বাঁধা নিয়মে বা রুটিনে চলা জীবন বললে ভুল করা হবে, এ জীবন বৈচিত্র্যময়-বিচিত্রতর ক্ষেত্রে তা নিজেকে প্রকাশিত করেছে।”^৮

বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীরা অর্থ উপার্জনের জন্য চার দেওয়ালের গণ্ডী অতিক্রম করায় তাদের কেবল সাহসিকতার পরিচয়ই মেলে না, সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক সচ্ছন্দের পথও যে সুগম হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে অন্যদিকে একটা বড় সমস্যাও দেখা দেয়। বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের নারী-পুরুষরা অর্থ উপার্জনের জন্য বেরিয়ে পড়ায় তারা পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে মেলা-মেশার সময় পায় না। ফলস্বরূপ তাদের পরিবারের সন্তানরা একাকিত্ববোধ করে। আলোচ্য উপন্যাসের মানিক ও মালবীর ছেলে প্রোটন ওরফে গিগা এবং প্রবাল ও মল্লিকার মেয়ে প্রল্লিকা ওরফে পুকাইও সেই একাকিত্ব অনুভব করে। কেননা তাদের সঙ্গে খেলাখুলা করার যেমন সঙ্গী নেই, তেমনি কথা বলারও কেউ নেই। স্বাভাবিকভাবে তারা বড়ই একা। বাবা-মায়ের অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে তারা নিজেদের স্বপ্নই

ভুলে যায়। আর এই কারণে তারা আধুনিক প্রযুক্তি তথা কম্পিউটারে যেমন গেমস খেলে, তেমনি তাদের মনের কথা কম্পিউটারের গোপন ফাইলে লুকিয়ে রাখে। অর্থাৎ কম্পিউটারই তাদের খেলা ও কথা বলার একমাত্র সঙ্গী হয়ে ওঠে। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী তা চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন –

“কি আর করবে পুকাই, এ জন্য কম্পিউটারের সঙ্গে আড্ডা মারে। কিছুক্ষণ উইন্ডোজ-এর সঙ্গে, কিছুক্ষণ এম-এস ওয়ার্ডের সঙ্গে, কিছুক্ষণ মাইক্রোসফট-এর সঙ্গে। ফাইল মার্কিং করে, ড্রইং করে, ইন্ডোর ক্রিকেট খেলে। জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে গিগার সঙ্গে গল্প করে। গিগাকে আসতে বলে, গিগা আসে না। আগে আসতো। কমপ্লেক্স। গিগার কম্পিউটার নেই, পুকাইয়ের আছে, তাই! কম্পিউটারটা আসার পর দু’তিন দিন পরপর এসেছিল। এখন আসে না। পুকাইও যায় না। কেন যাবে? ও কি আসে?”^৯

আলোচ্য উপন্যাসে মানিক-মালবীর মতোই অপর একটি পরিবার হল প্রবাল-মল্লিকার পরিবার। দুটি পরিবারই মধ্যবিত্ত হলেও প্রবাল ও মল্লিকার স্বপ্ন একটু ভিন্ন। মানিক-মালবীর স্ট্যাটাস যেখানে বালুচরী শাড়ি কিংবা অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিনের উপর নির্ভর করে, সেখানে প্রবাল-মল্লিকার স্ট্যাটাস নির্ভর করে নিজেদের একটা ফ্ল্যাট ও গাড়ির উপর। তা সে নতুন বা পুরনো হলেও ক্ষতি নেই। কেননা ফ্ল্যাটের প্রায় প্রত্যেকের যেখানে গাড়ি আছে, সেখানে প্রবালের একটা গাড়ি না হলে যেন ঠিক নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না। তাই যেকোনো উপায়েই প্রবাল একটা গাড়ি ক্রয় করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। এমনকি এই গাড়ির জন্য প্রবাল সংসারে সন্তান আনতেও দেরি করেছিল –

“তবু সন্তান আনেনি। আগে একটা গাড়ি। গাড়ি করে নার্সিংহোমে যাবে মল্লিকা। নিজেদের গাড়ি। গাড়ি চেপে সন্তান আসবে। গাড়ি চেপে স্কুলে যাবে ওদের সন্তান।”^{১০}

যাইহোক প্রবালের একসময় একটা সেকেন্ডহ্যান্ড ফিয়াট গাড়ি কেনার সৌভাগ্য হয়। খুব ভালো সিটকভার লাগানোর পাশাপাশি নিজের মনের মতো করে প্রবাল গাড়িটা সাজিয়েছিল। তখন সেই পাড়ায় একমাত্র প্রবালেরই গাড়ি ছিল। ফলে প্রবালের চলাফেরার ধরণও বদলে যায়। কেননা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভরা সেই সময় গাড়ি কিনতে না পারলেও প্রবাল কিনতে পেরেছিল। এটা তার কাছে যেমন গর্বের, তেমনি মর্যাদারও। কিন্তু কালশ্রোতে এই গাড়িটাই যেন তার মর্যাদার হানির কারণ হয়ে ওঠে। ফলে প্রবাল এই গাড়িটা বিক্রি করার জন্য বিজ্ঞাপনও দেয়। কেননা প্রবালের পক্ষে এই গাড়ি নিয়ে আর বাইরে বেরনো সম্ভব নয় –

“এখন এই গাড়ি নিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি যেতে লজ্জা করে। মাতিজ, স্যান্টো, ইন্ডিকা, উনো, মারুতি-জেন-এর যুগে লড়ঝড়ে ফিয়াটটা প্রবালের প্রেস্টিজে প্লাস্টিক পেইন্ট করা দেয়ালে পানের পিকের মত। খুব দরকার না হলে আজকাল গাড়িটা ব্যবহার করে না প্রবাল। একটা স্যান্টো, মাতিজ, উনো বা নিদেনপক্ষে একটা মারুতি-আটশো নেই বলে হীনমন্যতা বোধ প্রবালের, নইলে ওর ফ্ল্যাটের লোকদের গায়ে পড়ে বলার দরকার কী ফিয়াটটা পুরনো হলে কি হবে, ইনজিনটা দারুণ। সুজুকিই বলুন আর টাটাই বলুন এই ইনজিন দিতে পারবে না।”^{১১}

এ কেবল স্বপ্নপূরণ নয়, ভয়ংকর প্রতিযোগিতাও বটে। নিজেদের সামাজিক মর্যাদা ধরে রাখার প্রতিযোগিতা। বর্তমান সময়ে নিত্য নতুন বিলাসপণ্যের হাতছানিকে উপেক্ষা করতে না পেরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটা বড় অংশ অধিক পরিমাণ অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টায় নিজেদের নিয়োজিত করেছে। আর এই মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের এই সব বাবা-মায়েরা নিজেদের অজান্তেই যে কত বড় ক্ষতি করে বসে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা মল্লিকা যখন একটি সন্তানের জন্য তার স্বামীর কাছে কাকুতি মিনতি করেছিল, তখন প্রবাল বিত্ত-বৈভবের পেছনে ছুটেছে। শেষ পর্যন্ত সন্তান নেওয়ার প্রবল ইচ্ছে থাকলেও সেই ইচ্ছে তাদের পূরত হয় না। স্বাভাবিকভাবে ই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ইনফার্টিলিটির পরীক্ষায় মল্লিকা সফল হলে সে বুজতে পারে এক্ষেত্রে প্রবালের অক্ষমতা রয়েছে। ফলে মল্লিকা হতাশ হয়ে যায়। তবে প্রবালের বন্ধু শুভ তাকে আশার আলো দেখায়। যদিও সেই সময়ে এই বিষয়ে প্রবাল কিছুই জানতে পারেনি। ফলে তাদের সন্তানের জন্ম হলে তারা কতই না আনন্দ হয়েছে। এরপরেও মল্লিকা প্রবালের সঙ্গে দীর্ঘদিন সাংসারিক

জীবনের অভিনয় করেছে। কিন্তু একটা সময় প্রবাল এইসব ব্যাপারে জানতে পেরে মল্লিকার উপর দোষারোপ করলে মল্লিকা শান্তভাবেই প্রবালকে বোঝানোর চেষ্টা করে বলেছে –

“পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে অনেক অভিনয় প্রকৃত সত্যি হয়ে যায়। ওকে কেন নিজের মেয়ে বলে ভাবতে পারছ না! মানুষ দত্তক নেয় না? নিজের ঔরসের সন্তানের যদি এতই শখ ছিল তো বিয়ে করার পর সন্তানের জন্ম দাওনি কেন? কেন তখন কেবল সম্পত্তির পিছনে, গাড়ির পিছনে, লোহার পিছনে ছুটে বেড়িয়েছ? কেন? এখন তোমার নিজের ঔরসের প্রতি এত মায়া?”^{১২}

তবে মল্লিকা যে প্রবালকে ভালোবাসেনি তা নয়, সে প্রবালকে অন্তর থেকেই ভালোবেসেছিল। হয়তো সংসারের সুখ-শান্তির কথা ভেবেই মল্লিকা শুভর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। কিন্তু প্রবালের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই শেষপর্যন্ত প্রবাল ও মল্লিকার বিচ্ছেদ ঘটেছে। সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখতে গিয়ে মধ্যবিত্তদের যে অনেক সময়ই অভিনয় করে যেতে হয় স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর ‘কম্পিউটার গেমস’ উপন্যাসে তা অত্যন্ত সুকৌশলে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

Reference:

১. ঘোষ, দীপেন, ‘বাংলার মধ্যবিত্ত’, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১
২. চৌধুরী, রমাপদ, ‘গদ্য সংগ্রহ’, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১১
৩. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, ‘কম্পিউটার গেমস’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১৬
৪. তদেব, পৃ. ১৬
৫. ঘোষ, বিনয়, ‘মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ’, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ২২
৬. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
৭. তদেব, পৃ. ৩০
৮. আচার্য, ড. মধুমিতা, ‘স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত কর্মরতা মেয়েদের ভূমিকা’, কমলিনী প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৫৬-৫৭
৯. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
১০. তদেব, পৃ. ৩৮
১১. তদেব, পৃ. ৩৬
১২. তদেব, পৃ. ৭৫